সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

ভাঙ্গা ও গড়া

ভাঙ্গা ও গড়া

ভাঙ্গা ও গড়া

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৫১

২০তম প্রকাশ

শাওয়াল	১৪২৫
অগ্রহায়ণ	১৪১১
নভেম্বর	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
(বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত)
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بناؤ اور بگاڑ -এর বাংলা অনুবাদ

VANGA-O-GARA by Sayeed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 6.00 Only.

ভারত বিভাগের পূর্বাহ্নে পূর্ব-পাঞ্জাবে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার তিন মাস পূর্বে ১৯৪৭ সালের ১০ই মে পাঠান কোটের দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) প্রদত্ত বক্তৃতা। এই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য হিসাবে তিনি স্রষ্টার এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে না ভাঙ্গিয়া, গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে গড়িতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং যাদের গঠনমূলক কাজের যোগ্যতা বেশী, প্রাকৃতিক নিয়মের গতিধারায় তাদের হাতেই যে কর্তৃত্ব আসিবে, আল্লাহর সেই শাশ্বত বিধানও স্মরণ করাইয়া দেন।

উক্ত বক্তৃতা পুস্তিকাকারে- "বানাও আওর বিগাড়" নামে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় এই বইয়ের প্রকাশ সংখ্যা কয়েক লক্ষে পৌছিয়াছে। বাংলা ভাষায় ইহা 'ভাঙ্গা ও গড়া' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত বইখানির বেশ কয়েকটি সংস্করণ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া গিয়াছে। বইখানি যে পাঠক সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহা উহার ক্রমবর্ধমান চাহিদা হইতেই প্রমাণিত হয়। আধুনিক প্রকাশনী এই কারণেই বইখানি পাঠকদের সামনে পেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়াছে। আমরা আশা করি পাঠক সমাজ ইহা হইতে যথার্থ প্রেরণা লাভ করিবেন।

–প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভাঙ্গা ও গড়া

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সবই আল্লাহর জন্য। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি এবং ভাল–মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্ব দানের জন্য তিনি তাঁর সর্বোত্তম বান্দাদেরকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে মানবতা শিক্ষা দিয়েছেন, সৎলোকের মতো জীবন যাপন করা শিখিয়েছেন এবং মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যে সমস্ত নিয়ম–নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করলে মানুষ দুনিয়ায় সুখ–শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারে তাও তাঁরা বলে এবং দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সমবেত ভদ্রমন্ডলী ও মহিলাবৃন্দ।

যে আল্লাহ এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করে পৃথিবী পৃষ্ঠকে বিছানার মতো করে তৈরী করেছেন এবং তার উপর মানুষের বসবাস করার সুব্যবস্থা করেছেন, তিনি অন্ধের মতো আন্দায–অনুমানের ভিত্তিতে কোন কাজ করেন না। কোন কিছু না দেখে শুনে অন্ধকারে হাতড়িয়ে সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেবার মতো বাদশাহ তিনি নন। তাঁর নিজস্ব আইন কানুন, বলিষ্ঠ নিয়ম–নীতি, সুদৃঢ় ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতি রয়েছে। তদনুযায়ী তিনি সমগ্র বিশ্ব

জাহানের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করছেন। পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পানি, বাতাস, বৃক্ষ, পশু-পাখি ইত্যাদির মতো আমরা গোটা মানব জাতিও তাঁর প্রাকৃতিক আইন ও নিয়মের অধীনে সুসংবদ্ধ। আমাদের জন্ম ও মৃত্যু, আমাদের শৈশব, আমাদের যৌবন ও বার্ধক্য, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, আমাদের পাকস্থলী ও রক্ত চলাচল, আমাদের সুস্থতা ও অসুস্থা ইত্যাদি সব কিছুর ওপরই তাঁর চিরন্তন প্রাকৃতিক আইন ও নিয়মের কর্তৃত্ব একটানাভাবে রীতিমত চলছে। এ ছাড়া তাঁর আর একটা আইনও রয়েছে। সেটা তাঁর প্রাকৃতিক আইনের মতই আমাদের ইতিহাসে উঠা-নামা, আমাদের উত্থান-পতন, আমাদের উন্নতি-অবনতি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত-তথা দেশ ও জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ওপর কর্তৃত্ব করছে। আল্লার প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী নাকের বদলে চোখের সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করা এবং পেটের বদলে হৃদয়ে খাদ্য হজম করা যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে যে পথে চললে আল্লার আইন অনুযায়ী কোন জাতির অধপতন হওয়া উচিত, সেই পথে তার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আগুন যেমন একজনের জন্যে গরম এবং আরেক জনের জন্য ঠান্ডা নয়, তেমনি আল্লার আইন অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ খারাপ তা এক জনকে অবনত এবং আর এক জনকে উন্নত করতে পারে না। মানুষের ভাল-মন্দের জন্য আল্লাহ যে নিয়ম-নীতি নির্ধারিত করেছেন, তা কারোর চেষ্টায় পরিবর্তিত ও বাতিল হতে পারে না, তার ভেতর কারো সঙ্গে শত্রুতা এবং কারো সঙ্গে স্বজনপ্রীতিও নেই। আল্লার এই আইনের সর্ব প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে এই যে; তিনি গড়া পসন্দ করেন এবং ভাঙ্গা পসন্দ করেন না। সব কিছুর মালিক হিসেবে তিনি তাঁর দুনিয়াকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে চান। একে অতিমাত্রায় সুসজ্জিত করতে চান। তাঁর যাবতীয় উপায় উপাদান এবং শক্তি ও যোগ্যতাকে সুষ্ঠ পন্থায় ব্যবহার করতে চান। তিনি কখনও তাঁর দুনিয়ার ধ্বংস ও অনিষ্ট সাধন করেন না। বিশৃংখলা, কুকর্ম,

অত্যাচার ও অনাচার করে তাঁর দুনিয়াকে শ্রীহীন সৃষ্টিতে পরিণত করাকে তিনি কোন দিন পসন্দ করবেন বলে আশাও করা যেতে পারে না। যে সমস্ত লোক দুনিয়া পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাদের ভেতর থেকে কেবলমাত্র তারাই আল্লার দৃষ্টিতে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়, যারা এ দুনিয়াকে গড়বার যোগ্যতা অন্য সবার চেয়ে বেশী রাখে। এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকেই তিনি দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।

অতপর এসব ক্ষমতাসীন লোকেরা কতটুকু ভাংগে এবং কতটুকু গড়ে—সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা ভাঙার চেয়ে গড়তে থাকে বেশী এবং তাদের চেয়ে বেশী গড়ে ও কম ভাঙে— এমন কেউ কর্মক্ষেত্রে থাকে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের সমস্ত দোষ—ক্রটি সত্ত্বেও দুনিয়া পরিচালনার ক্ষমতা তাদের হাতেই রাখেন। কিন্তু যখন তারা গড়ে কম এবং ভাঙ্গে বেশী, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য লোকদেরকে ঐ একই শর্তে ক্ষমতা দিয়ে থাকেন।

এটা একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আইন। আপনাদের বিচার বুদ্ধিও প্রমাণ করবে যে, আইনটি এমনই হওয়া উচিত। যদি আপনাদের কারোর একটি বাগান থাকে এবং তিনি একজন মালীকে তার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন, তাহলে আপনি নিজেই বলুন, তিনি ঐ মালীর নিকট সর্বাগ্রে কি আশা করবেন? মালী তার বাগান খানা নষ্ট না করে তাকে পরিপাটি করে সুসজ্জিত করবে, এ ছাড়া তিনি তার কাছে আর কি কামনা করতে পারেন? তিনি অবশ্যি নিজের বাগানের ক্রমোন্নতি চাইবেন। তার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি, পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা, শোভা ও সৌন্দর্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধিই হবে তার কাম্য। যে মালিকে তিনি দেখবেন অত্যন্ত প্ররিশ্রম, যোগ্যতা ও মনোযোগ সহকারে সুনিপুণভাবে বাগানের সেবা যত্ন করছে, বাগানের সাজ সজ্জার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখছে, তার চেষ্টা ও যত্নে ভাল দরকারী গাছগুলো বেশ সতেজ ও সুন্দর হচ্ছে, সে আগাছা, আবর্জনা ও বন—জঙ্গল পরিষ্কার

করছে, তার সুরুচি ও শিল্প শক্তি দিয়ে উৎকৃষ্ট ও নতুন ফল-মূল ও ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধি করছে-তার ওপর তিনি অবশ্য সন্তুষ্ট হবেন। তিনি তাকে ভালবাসবেন এবং উচ্চ মর্যাদা দেবেন। এমন উপযুক্ত, কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, অনুগত ও সুযোগ্য মালীকে তাড়িয়ে দেয়া তিনি কোন দিনই পসন্দ করবেন না। কিন্তু এ না হয়ে যদি ঠিক এর উল্টোটাই হয় অর্থাৎ যদি তিনি দেখেন যে, মালী অযোগ্য-অপদার্থ ও ফাঁকিবাজ, সে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বাগানের ক্ষতি করছে, গোটা বাগানটা আবর্জনা ও বন-জঙ্গলে ভরে গিয়েছে, গাছের পাতা ও ডালগুলো ভেঙে পড়েছে, কোথাও বিনা প্রয়োজনে পানি বয়ে যাচ্ছে, আবার কোথাও পানির অভাবে মাঠ ও গাছপালা সব শুকিয়ে যাচ্ছে,আগাছা, বন-জঙ্গল ও আবর্জনা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, ভাল ভাল গাছগুলো মরে গিয়ে আগাছায় বাগান ভরে যাচ্ছে, তাহলে বলুন, বাগানের মালিক এমনতর মালীকে কি করে পসন্দ করতে পারে? কোন সুপারিশ, কাকুতি-মিনতি, সবিনয় নিবেদন ও প্রার্থনা এবং উত্তরাধিকার ও মনগড়া অধিকারের দরুন মালিক তার বাগানের দায়িত্বভার এমন অযোগ্য মালীর ওপরই ন্যস্ত রাখবে? বড় জোর এতটুকু হতে পারে যে, সে মালীকে শাসিয়ে দিয়ে আর একবার তাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেবে। কিন্তু যে মালীর কোন শাসনেই চৈতন্য হয় না এবং ক্রমাগত বাগানের ক্ষতিই করতে থাকে, তাকে কান ধরে বের করে দিয়ে অন্য কোনো ভাল মালী নিযুক্ত করা ছাড়া মালিকের পক্ষে এ সমস্যার আর কি সমাধান হতে পারে?

যদি নিজের সামান্য একটা বাগান পরিচালনার ব্যাপারে আপনি অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, তাহলে চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ তাঁর এতবড় ভূমণ্ডলটা এত সব উপায় উপকরণসহ মানুষের কর্তৃত্বাধীনে রেখে দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তুর ওপর তাকে এত ক্ষমতা ও অধিকার দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে মানুষ তাঁর দুনিয়াকে সুন্দর করে গড়ে তুলছে, না ধ্বংস করেছে, এ বিষয়টা তিনি কি করে উপেক্ষা করতে পারেন? আপনি যদি

তাঁর দুনিয়াকে সুন্দর করে গড়তে থাকেন তবুও তিনি আপনাকে ক্ষমতা থেকে অযথা সরিয়ে দেবেন– এমনতর হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি আপনি গঠনমূলক কোন কিছু না করেন এবং আল্লাহর এ বিরাট বাগানখানাকে একেবারে উজাড় ও ধ্বংস করতেই থাকেন, তাহলে আপনার দাবীকে নিজের বুদ্ধি–বিবেক অনুযায়ী যতই জোরদার মনে করুন না কেন তিনিত তাঁর বাগানে আপনার কোন অধিকার স্বীকার করবেন না। প্রথমে তিনি আপনাকে সাসিয়ে হুঁশিয়ার করে দেবেন এবং সংশোধনের দু'চারটে সুযোগ দেবেন। পরিশেষে আপনাকে পরিচালকের মর্যাদা থেকে পদচ্যুত করেই ছাড়বেন।

এ ব্যাপারে একটা বাগানের মালিকের দৃষ্টিকোণ ও মালীর দৃষ্টি কোণ যেমন বিভিন্ন তেমনি আল্লার দৃষ্টিকোণ ও মানুষের দৃষ্টিকোণের মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে। ধরুন, মালীদের এক পরিবার বংশানুক্রমে একজন লোকের বাগানে কাজ করে আসছে। তাদের পূর্ব পুরুষের কাউকে হয়তো তার যোগ্যতা ও জ্ঞান–বুদ্ধির দরুন বাগানে নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার সন্তান–সন্ততিও বাগানে কাজ সন্দুরভাবে করেছিল, তাই বাগানের মালিক চিন্তাকরে দেখলো যে অযথা এদেরকে সরিয়ে অন্য মালী নিযুক্ত করার কি দরকার? এরাও যখন ভালভাবেই কাজ করছে, তখন এদের অধিকার অন্যের চেয়ে বেশী। এভাবে মালীদের এই বংশ স্থায়ীভাবে বাগানে কাজ করতে লাগলো। কিন্তু কিছুকাল পরে এ বংশের মালীরা একেবারে অযোগ্য, অপদার্থ, ফাঁকিবাজ, আলসে, কুঁড়ে ও অবাধ্য হয়ে পড়ল। বাগান পরিচালনার কোন যোগ্যতাই তাদের রইল না। এখন তারা গোটা বাগানটার সর্বনাশ করতে শুরু করেছে, তবুও তাদের দাবী এই যে, তারা তাদের বাপ–দাদার আমল থেকে পুরুষানুক্রমে এ বাগানে বাস করে আসছে, তাদের পূর্ব–পুরুষদের কারুর দ্বারা এ বাগান গড়ে উঠেছিল, কাজেই এতে তাদের জন্মগত অধিকার রয়েছে এবং তাদেরকে সরিয়ে অন্য কাউকে এ বাগানের পরিচালনার জন্য মালী নিযুক্ত করা

কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। এটিই ঐ অযোগ্য ও অপদার্থ মালীদের দৃষ্টিকোণ। কিন্তু বাগানের মালিকের দৃষ্টিকোণও কি অনুরূপ হতে পারে? সে কি একথাই বলবে না– আমার কাছে তো বাগানের সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিচালনাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমি তো মালীদের কোনো পূর্ব–পুরুষের জন্য এ বাগান করিনি। বরং তাদের পূর্ব–পুরুষের কাউকে আমার বাগানের কাজের জন্য চাকর রেখেছিলাম। বাগানে তাদের যা কিছু অধিকার আছে তা যোগ্যতা ও কাজের শর্তাধীন। তারা বাগানকে ঠিকমত গড়ে তুললে তাদের সমস্ত অধিকার বিবেচনা করা হবে। নিজের পুরানো মালীদের সংগে আমার এমন কি শত্রুতা থাকতে পারে যে, তারা ভালোভাবে কাজ করলেও আমি অযথা তাদেরকে তাড়িয়ে অন্য মালিদেরকে নিযুক্ত করবো? কিন্তু যে বাগানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তোমাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল সেটিকেই যদি তোমরা নষ্ট ও উজাড় করে ফেল, তাহলে তোমাদের কোন অধিকারই আমি স্বীকার করব না। অন্য যারা এ কাজ ঠিকমত করতে চায় আমি তাদেরকে বাগান পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা দান করবো এবং তাদের অধীনে তোমাদের চাকুরী করতে হবে। এতেও যদি তোমরা ঠিক না হও এবং অধীনস্ত হিসেবেও যদি তোমরা অকেজো প্রমাণিত হও বরং শুধু নষ্ট করতেই থাক, তাহলে আমি তোমাদেরকে এ বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য মালীদেরকে এখানে নিযুক্ত করবো।

দৃষ্টিকোণের এই পার্থক্য যেমন একটা বাগানের মালিক ও মালীর মধ্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে দুনিয়ার মালিক ও দুনিয়াবাসীদের মধ্যেও। দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন এলাকাকে স্বদেশ ভূমি বলে দাবী করে। বংশানুক্রমে তারা এবং তাদের পূর্ব–পুরুষগণ সেখানে বসবাস করে আসছে। তাদের দেশের ওপর তাদের কর্তৃত্ব করার জন্মগত অধিকার রয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে। কাজেই তাদের মতে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই প্রাপ্য। বাইরের আর

কারুর সেখানে কর্তৃত্ব করার কোন অধিকার নেই। এ হচ্ছে দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিকোণ। কিন্তু দুনিয়ার আসল মালিক আল্লার দৃষ্টিকোণ এটা নয়। তিনি কখনো এ সব জাতীয় অধিকার স্বীকার করেননি। প্রত্যেক দেশের ওপর তার অধিবাসীদের জন্মগত অধিকার রয়েছে এবং সে অধিকার থেকে তাদেরকে কোনক্রমেই বঞ্চিত করা চলবে না– এমন কোন কথা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি তো দেখেন, কোন্ দেশে কোন্ জাতি কি কাজ করছে। যদি কোন জাতি তার দেশে গঠনমূলক কাজে লিপ্ত থাকে, তার সমস্ত শক্তিসামর্থ দুনিয়ার সংশোধন ও উন্নতির জন্য নিয়োগ করে, সব রকমের মন্দ কাজ প্রতিরোধ করে এবং ভালো কাজের ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে দুনিয়ার মালিক বলেন, অবশ্য তোমরা দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অধিকারী। তোমরা পূর্ব থেকেই এ দেশে বসবাস করে আসছ এবং দেশ পরিচালনারও যোগ্যতা রাখ। কাজেই অন্যান্য জাতির চেয়ে তোমাদের অধিকারই অগ্রগণ্য। কিন্তু যদি ব্যাপারটা উল্টো হয় অর্থাৎ যদি গড়ার পরিবর্তে শুধু ভাঙ্গার কাজই হতে থাকে, সৎকাজের বদলে দেশ জুড়ে কেবল অসৎ ও অবৈধ কাজই সংঘটিত হয় এবং আল্লাহ দুনিয়ায় যা সৃষ্টি করেছেন তাকে কোন ভাল কাজে না লাগিয়ে বেপরোয়াভাবে নষ্ট করা হয়– এক কথায় দেশকে গড়ার বদলে ভেঙ্গে ফেলা হয়– তাহলে আল্লাহ এহেন জাতিকে প্রথমে কিছুটা হালকা এবং কিছুটা কঠিন আঘাত দেন, যাতে করে তারা সতর্ক হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে। এতেও যে জাতি ঠিক না হয়, তার কাছ থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অন্তত এর চেয়ে যোগ্যতর জাতিকে দেয়া হয়। এখানেই শেষ নয়। যদি পূর্ববর্তী জাতির লোকেরা পরাধীন হওয়ার পরও কোন যোগ্যতা ও গুণবৈশিষ্ট্যের প্রমাণ না দেয় এবং তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণ করে যে, বিকৃত করা ছাড়া তাদের দ্বারা আর কোন কাজই হবে না, তাহলে এহেন জাতিকে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন। তারপর তাদের স্থানে অন্য

কোন জাতিকে আনেন। এ ব্যাপারে সব সময়ই মালিকের যে দৃষ্টিভংগি হওয়া উচিত, আল্লারও তাই হয়ে থাকে। তিনি তাঁর দুনিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে দাবীদার ও প্রার্থীদের উত্তরাধিকার অথবা জন্মগত অধিকার দেখেননা। তিনি দেখেন কার গড়ার যোগ্যতা বেশী এবং ভাঙ্গবার দিকে ঝোঁকপ্রবণতা কম রয়েছে। একই সময়ের প্রার্থীদের মধ্যে যারা এ দিক দিয়ে যোগ্যতর বলে প্রমাণিত হয়, তাদেরকেই দেশ পরিচালনার জন্য নির্বাচন করা হয়। যতদিন এদের ধ্বংসাত্মক কাজের চেয়ে গঠনমূলক কাজ বেশী হতে থাকে অথবা এদের তুলনায় বেশী ভাল করে গঠনমূলক কাজ করে এবং ধ্বংসাত্মক কাজও কম করে–এমন কেউ এগিয়ে না আসে–ততদিন দেশ পরিচালনার ক্ষমতা এদের হাতেই রাখা হয়।

এসব যা কিছু আমি বলছি, ইতিহাসে এর জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ চিরকালই এ নীতি অনুযায়ীই তাঁর দুনিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন। দূর দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিন। নিজেদের এ দেশের ইতিহাসটাই পর্যালোচনা করুন। এ দেশে যেসব জাতি প্রথমে বাস করতো, তাদের গঠনমূলক যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা যখন শেষ হয়ে গেলো তখন আল্লাহ আর্য জাতিকে এ দেশ পরিচালনার সুযোগ দিলেন। সে সময় অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে যোগ্যতম ছিল আর্য জাতি। তারা এখানে এসে এক উন্নত তামাদ্দুন ও সভ্যতা গড়ে তুলল। বহু জ্ঞান ও শিল্প আবিষ্কার করল। ভূগর্ভের গোপন সম্পদ উদ্ধার করে তাকে ভাল কাজে ব্যবহার করল। ধ্বংসাত্মক কাজের তুলনায় গঠনমূলক কাজই তারা বেশী করেছিল। এ সব যোগ্যতা যতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিল ততদিন ইতিহাসের সমস্ত উথান–পতন সত্ত্বেও তারাই ছিল এ দেশের পরিচালক। অন্যান্য জাতি ক্ষমতা দখলের জন্য বার বার এগিয়ে এসেছে কিন্তু তাদেরকে হটিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ আর্যদের মতো যোগ্য জাতি ক্ষমতাসীন থাকাকালে অন্য কোন পরিচালকের প্রয়োজন ছিল না। আর্যরা যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বিপথে

চলা শুরু করে, তখন তাদের ওপর যেসব বৈদেশিক আক্রমণ হয়, সেগুলোকে তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে সতর্ককারী দূত স্বরূপ বলা যায়। কিন্তু তারা সতর্ক না হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজেই লিপ্ত থাকে। গঠনমূলক কাজের তুলনায় তারা ধ্বংসাত্মক কাজ করতে থাকে অনেক বেশী। তাদের নৈতিক অধপতন এমন চরমে পৌঁছে যে, বামমার্গ আন্দোলনে আজো তার চিহ্ন আপনারা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন। মানবতাকে বিভক্ত করে তারা নিজেদেরই সমাজকে বর্ণ ও গোত্রে খণ্ডিত করল। সমাজ জীবনকে একটি সিঁড়ির মতো করে গঠন করল। এ সিড়িঁর প্রত্যেক ধাপের লোকেরা তাদের ওপরের ধাপের লোকদের বান্দা বা দাস এবং নীচু ধাপের লোকদের খোদা বনে বসল। তারা আল্লার লাখো লাখো বান্দার ওপর নির্মম যুলুম নির্যাতন চালাতে লাগল। এ যুলুম আজো অচ্ছুত শ্রেণীর আকারে বিদ্যমান রয়েছে।

তারা জ্ঞান–বিজ্ঞানের পথ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ করে দিল। তাদের পণ্ডিত ও পুরোহিতরা সাপের মত জ্ঞান ভান্ডারের চারদিক বেষ্টন করে বসে রইল। তাদের ওপরের তলার কর্তারা দেশের জনসাধারণের ওপর নিজেদের বহু অন্যায় অধিকার চাপিয়ে দিল। এ অধিকার আদায় করা এবং আরাম–কেদারায় বসে বসে অন্যের পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে বিলাসী জীবন যাপন করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ রইলো না। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মধ্য এশিয়ার কতিপয় জাতিকে এখানে পরিচালনার সুযোগ দিলেন। এ জাতিগুলো সে সময় ইসলামী আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে জীবন যুদ্ধের উন্নততর যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

কয়েকশো বছর তারা এ দেশ পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিল। এ দেশেরও বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সাথে মিশে গিয়েছিল। অবশ্যি তারাও অনেক কিছু ধ্বংস করেছে। কিন্তু যে পরিমাণ ধ্বংস করেছে, তার চেয়ে বেশী সৃষ্টি করেছে। কয়েকশো বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত গঠনমূলক কাজ হয়েছে তা

সবই তাদের দ্বারা অথবা তাদের প্রভাবে সম্পাদিত হয়েছে। তারা দেশে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছে। চিন্তা ও ভাবধারা পরিশুদ্ধ করেছে। সমাজ, তামাদ্দুন ও সভ্যতার অনেক কিছু সংশোধন করেছে, দেশের উপায়–উপাদানকে সে যুগের উপযোগী করে কল্যাণের পথে ব্যবহার করেছে। সর্বোপরি তারা শান্তি ও সুবিচারের এমন সুষ্ঠ ব্যবস্থা কায়েম করেছিল যা ইসলামের সত্যিকার শান্তি সুবিচার থেকে অনেক নিম্নমানের হলেও ইতিপূর্বেকার এবং আশে পাশের দেশগুলোর অবস্থার তুলনায় অনেকখানি উঁচুস্তরের ছিল। অতপর তারাও পূর্ববর্তীদের ন্যায় পথভ্রষ্ট হতে লাগল এবং তাদের মধ্যেও গঠনমূলক কাজের যোগ্যতা কমে যেতে লাগল এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতি ঝোঁকপ্রবণতা বেড়ে চলল। তারাও উঁচু–নীচু, বংশ মর্যাদা ও শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করে নিজেদের সমাজ ও জাতিকে খন্ডবিখন্ড করে ফেলল। এজন্য চারিত্রিক, রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে। তারাও ইনসাফের তুলনায় যুলুম, নির্যাতন অনেক বেশী করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গিয়ে তারা শুধু তাথেকে স্বার্থসিদ্ধি এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অবৈধ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় মেতে উঠল। উন্নতি ও সংস্কারমূলক কাজ ছেড়ে দিয়ে তারাও আল্লা প্রদত্ত শক্তি ও উপায় উপাদান নষ্ট করতে এবং সেগুলোকে ধ্বংমাত্মক কার্যকলাপে ব্যবহার করতে লাগল। দৈহিক আরাম ও ভোগ–লালসায় তারা এতই মত্ত হয়ে গেল যে, তাদের শাসনকর্তাদেরকে যখন দিল্লীর লালকেল্লা থেকে পলায়ন করতে হয়েছিল, তখন তাদের শাহজাদারা–যারা গতকাল পর্যন্ত সিংহাসনের দাবীদার ছিল–নিজেদের জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করতে পারেননি। কেননা মাটির ওপর দিয়ে চলার অভ্যাস তারা পরিত্যাগ করেছিল। মুসলমানদের সাধারণ নৈতিক চরিত্রের চরম অধপতন হয়েছিল। একেবারে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বড় বড় হোমরাচোমরা দায়িত্বশীল লোকদের পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর পরোয়া ছিল না। ফলে ধর্ম, জাতি

ও দেশকে অন্যের হাতে বিকিয়ে দেয়ার পথে তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো আর কিছুই রইল না। তাদের মধ্যে জন্ম নিলো লাখো লাখো পেশাদার সিপাই। এদের নৈতিক চরিত্র ছিল পোষা কুকুরের মতো। যে কেউ খাবার দিয়ে এদেরকে পুষতে পারত এবং তারপর এদের দিয়ে ইচ্ছামতো শিকার করাতে পারত। এদের মধ্যে এ অনুভূতিই ছিল না যে, এই ঘৃণ্য পেশার বদৌলতেই শত্রুরা তাদের সাহয্যে তাদেরই দেশ জয় করেছে–এর একটি জঘন্যতম দিক আছে। গালিবের মতো কবিও এ সম্পর্কে গর্ব করে বলেছেনঃ "শত পুরুষ থেকে বাপ–দাদার পেশা হলো সৈনিক বৃত্তি।" এত বড় একজন কবি এ কথা বলার সময় এতটুকুও ভাবতে পারেননি যে, পেশাধারী সৈনিকবৃত্তি গর্বের বিষয় নয়–লজ্জায় মরে যাবার জিনিস।

মুসলমানেরা যখন এহেন অবস্থায় পৌছল, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত করলেন এবং গোটা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা আবার নতুন প্রার্থীদের হাতে যাওয়ার সুযোগ এলো। এ সময় দেশে মারাঠা, শিখ, ইংরেজ ও কতিপয় মুসলমান নেতা এই চারজন প্রার্থীকেই দেখা যাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদের নেশা ও স্বজাতির প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব থেকে মন ও মগযকে মুক্ত ও পবিত্র রেখে ন্যায়ভাবে তখনকার ইতিহাস ও পরবর্তী অবস্থা পর্যালোচনা করলে আপনার বিবেক এ কথা স্বীকার করবে যে, তখন গঠনমূলক কাজের যে যোগ্যতা ইংরেজদের ছিল তা অন্য কোন প্রার্থীর ছিল না এবং ইংরেজদের ভিতর যে পরিমাণ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ছিল তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল মারাঠা, শিখ ও মুসলমান প্রার্থীর ভেতর। ইংরেজরা যা কিছু গঠনমূলক কাজ করেছে তা অন্যান্য জাতিরা করত না। তারা যা কিছু নষ্ট করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী অন্যেরা নষ্ট করত। সাধারণভাবে দেখলে ইংরেজদের ভেতর বহু দিক দিয়ে অগণিত দোষ ও অন্যায় পাওয়া যাবে। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে তাদের সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে তাদের অন্যায়

অত্যাচার অনেক কম এবং গুণ গরিমা বেশী পাওয়া যাবে। এই জন্যই তো আল্লার আইন আর একবার মানুষের মনগড়া নীতির মূলোচ্ছেদ করলো। মানুষ বিনা অধিকারে এই নীতি রচনা করেছিল যে- "প্রত্যেক দেশের অধিবাসীগণ সে দেশের মালিক,তারা তাদের ইচ্ছামত দেশকে গড়তেও পারে, ভাঙ্গতেও পারে।" আল্লার আইন ইতিহাসের এই চিরন্তন ফায়সালা থেকে প্রমাণ করেছে যে-না, দেশ একমাত্র আল্লার, এর পরিচালনার ভার কাকে দেয়া হবে এ ফায়সালা তিনিই করবেন; এ ফায়সালা কোন বংশ, জাতি অথবা পিতা-প্রপিতার অধিকারের ভিত্তিতে হয় না। বরং কোন্ পরিচালনায় সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সে দিকে নযর রেখেই এ ফায়সালা গৃহীত হয়।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (ال عمران : ٢٦)

বলুন, হে আল্লাহ। দেশের মালিক। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য দিয়ে থাক এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে থাক এবং যাকে চাও তাকে সম্মান এবং যাকে চাও তাকে লাঞ্ছনা দিয়ে থাক। তোমারই হাতে রয়েছে সব মঙ্গল। তুমি নিসন্দেহে সব কিছুই করার ক্ষমতা রাখ। -আলে ইমরানঃ২৬

এই ভাবে হাযার হাযার মাইল দূরে থেকে একটি জাতিকে আল্লাহ এ দেশে নিয়ে এলেন। এরা এ দেশে সংখ্যায় তিন চার লাখের বেশী কোন সময়ই ছিল না। কিন্তু এরা এখানকার উপায় উপাদান ও মানুষ দিয়ে এ দেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি

সমস্ত শক্তিকে পরাজিত করে দেশের শাসনক্ষমতা দখর করল। এ দেশের কোটি কোটি অধিবাসী এ মুষ্টিমেয় ইংরেজদের অধীন হয়ে রইল। একজন ইংরেজ একাই একটি জিলা শাসন করেছে। তাও এমন অবস্থায় যে, এ কাজে তার হাত শক্তিশালী করার মতো তার জাতির কোন লোক এখানে ছিল না। এ সময় এ দেশের লোকেরা যা কিছু করেছে তা সবই চাকর হিসেবে করেছে– কার্যকারক হিসেবে নয়। ইংরেজদের শাসনামলে এ দেশে যেসব গঠনমূলক কাজ হয়েছে, তা তাদের দ্বারা এবং তাদের প্রভাবেই হয়েছে– এ কথা আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে। অস্বীকার করলে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে। তার তুলনায় আজকের অবস্থা দেখলে এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, তাদের অনিষ্টকারিতা সত্ত্বেও অনেক গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। এসব কাজ এ দেশবাসীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কোন আশাই ছিল না। এজন্যই তো আল্লাহ আঠারশো শতাব্দীর মাঝখানে এ দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা মোটেই ভুল ছিল না।

এখন দেখুন, ইংরেজরা যা কিছু গড়তে পারত তা গড়েছে আর বিশেষ কিছু তাদের দ্বারা গড়ে উঠতে পারে না। এখন তারা যা গড়তে পারে তা অন্যের দ্বারাও সম্ভব। ওদিকে তাদের ধ্বংসকারিতার বহর খুব বেড়ে গেছে। আর যতদিন তারা এ দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাকবে, ততদিন গড়ার চেয়ে ভাঙ্গবেই বেশী। তাদের অন্যায় ও অপরাধের ফিরিস্তি এত দীর্ঘ হয়েছে যে, তা এক বৈঠকে বর্ণনা করা মুশকিল। আর সেগুলো বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনও নেই। কারণ সেসব সবার চোখের সামনেই রয়েছে। তাদেরকে এখন এ দেশের শাসনক্ষমতা থেকে বেদখল করাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তারা নিজেরাই সোজাভাবে এ দেশ থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত হয়ে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

সোজাভাবে না গেলে বাঁকাভাবে তাড়িয়ে দেয়া হতো। কারণ আল্লাহর চিরন্তন আইন– এখন আর তাদের হাতে এ দেশের শাসনক্ষমতা রাখার পক্ষপাতি নয়।

দুনিয়ার প্রকৃত মালিক কোন দেশে এক প্রকার পরিচালনা ব্যবস্থা খতম করে অন্য প্রকার ব্যবস্থা কায়েম করার ব্যবস্থা করলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, আমরা এখন তারই দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছি। এটা ইতিহাসের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাহ্যদৃষ্টিতে এদেশে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হতে দেখা যাচ্ছে তাতে কেউ যেন এ প্রতারণায় না পড়েন যে, দেশের শাসনক্ষমতা দেশবাসীর হাতে দেয়ার এই যে সিদ্ধান্ত হচ্ছে তা একেবারে চূড়ান্ত ও চিরন্তন। বর্তমান পরিস্থিতির একটা সহজসাধ্য রূপ হয়তো আপনারা অনায়াসেই অনুধাবন করতে পারছেন যে, বিদেশ থেকে এসে যারা এ দেশ শাসন করছিল, এখন তারা নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। কাজেই এখন স্বাভাবিকভাবেই দেশের ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে আসাই উচিত। আসলে কিন্তু তা নয়। আল্লাহর সিদ্ধান্ত এরূপ হয় না। তিনি এই বিদেশীদেরকে পূর্বেও অকারণে আনেননি, আবার এখনো বিনা কারণে সরিয়ে দিচ্ছেন না। পূর্বে যেমন তিনি আপনাদের কাছ থেকে খামখেয়ালীভাবে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেননি, তেমনি এখনো আপনাদেরকে খামখেয়ালীভাবে এ ক্ষমতা দেবেন না। আসল ব্যাপার এই যে, বর্তমানে ভারতবাসীরা ক্ষমতার প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছে; হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাই প্রার্থী। যেহেতু এরাই দেশে প্রথম থেকে বসবাস করে আসছে, কাজেই তাদেরকেই প্রথম ক্ষমতা লাভের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এটা স্থায়ী নিযুক্তি নয়, বরং তাদের পরীক্ষার জন্যই এ সুযোগ দেয়া হচ্ছে। যদি তারা নিজেদের কার্যকলাপে প্রমাণ করে যে, ভাঙ্গার চেয়ে গড়ার যোগ্যতাই বেশী, তাহলে তাদেরকে এ দেশের শাসন ক্ষমতায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হবে। আর যদি

তারা গঠনমূলক কাজের চেয়ে ধ্বংসাত্মক কাজই বেশী করে, তবে তার পরিণাম খুব শিগগিরই ভোগ করবে। এ অবস্থায় তাদের কাছ তেকে এ দেশের শাসনক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অন্য কোন জাতিকে এ কাজের জন্য নির্বাচিত করা হবে। অতপর আর তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই করতে পারবে না। সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে নিজেদের অযোগ্যতার স্পষ্ট প্রমাণ দেয়ার পর তারা কোন্ মুখে অভিযোগ করবে? নাছোড়বান্দা হয়ে অনুনয় বিনয় করলেও তা শুনবেই বা কে?

এখন আপনারা একটু পর্যালোচনা করে দেখুন যে, এ দেশের হিন্দু–মুসলমান ও শিখ এ পরীক্ষায় আল্লার সামনে নিজেদের এমন কি যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, গুণ–গরিমা এবং কার্যকলাপ পেশ করেছে যে, তার ফলে আল্লাহ তাঁর দেশের শাসনক্ষমতা আবার তাদের হাতে সোপর্দ করবেন বলে তারা আশা করতে পারে। হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের অপরাধগুলো নৈতিকতার আদালতে পেশ করলে তারা সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি যদি এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে সেগুলো বলে দেই, তাহলে আশা করি আপনারা খারাপ মনে করবেন না। নিজের জাতি ও স্বদেশী ভাইদের দোষ ও অপরাধের মারাত্মক পরিণাম যেন স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তাদেরকে শিগগিরই এ পরিণামের সম্মুখীন হয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে। এ সব দোষ ও অপরাধ তাদেরকে ধ্বংস করবে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। আমি, আপনি কেউই এ মারাত্মক পরিণাম থেকে বাঁচতে পারবো না। এ জন্যে আমি অন্তরের বেদনা নিয়ে এগুলো বিবৃত করছি। এর ফলে যার কান আছে সে শুনে সংশোধনের কিছুটা চিন্তা করতে পারবে।

আমাদের দেশবাসীর সাধারণ নৈতিক চরিত্রের অবস্থা যে রকম হয়েছে তা আপনারা নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান

অনুযায়ী অনুমান করে দেখুন। আমাদের ভেতর শতকরা ক'জন সত্যিকার চরিত্রবান লোক আছে? কারোর অধিকার হরণ করা, কোন অবৈধ স্বার্থসিদ্ধি, কোন 'লাভজনক' মিথ্যা বলা এবং কোন 'লাভজনক' বিশ্বাস-ঘাতকতা করা নৈতিক দৃষ্টিতে খারাপ-শুধু এই কারণে আমাদের ক'জন এসব কাজ করতে ইতস্তত করে থাকে? যেখানে আইনের বাঁধন নেই অথবা যেখানে আইনের আওতা থেকে বাঁচবার আশা ও পথ আছে, সেখানে শতকরা ক'জন শুধু নিজের নৈতিক অনুভূতির বলে অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত থাকে? যেখানে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের আশা না থাকে, সেখানে ক'জন অন্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। এরূপ ক্ষেত্রে ক'জন অপরের দুঃখে দৈন্যে মনে ব্যাথা পায় এবং স্বার্থ ত্যাগ করে? নিস্বার্থভাবে ক'জন অপরের হক আদায় করে? ক'জন ব্যবসায়ী ধোঁকা-ফাঁকি, মিথ্যা, মুনাফাখোরী, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা থেকে বিরত থাকে? ক'জন শিল্পপতি নিজের স্বার্থের সংগে ক্রেতাদের স্বার্থ এবং নিজের জাতি ও দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখে? খাদ্যশস্য মজুদ রেখে অত্যধিক চড়া দরে বিক্রি করতে গিয়ে ক'জন জমিদার একটু ভেবে দেখে যে, তারা এই মুনাফাখোরীর দ্বারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে ভূখা রেখে অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছে? ক'জন ধনী ব্যক্তি ধনোপার্জনে অন্যায়, অত্যাচার, অধিকার হরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে মুক্ত রয়েছে? আমাদের দেশের শ্রমজীবিদের মধ্যে ক'জন সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করে তাদের বেতন ও পারিশ্রমিক গ্রহণ করে? ক'জন সরকারী কর্মচারী ঘুষ, আমানতে খেয়ানত, অত্যাচার, উৎপীড়ন, কর্তব্যে অবহেলা, হারাম খাওয়া এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে? উকিল, চিকিৎসক, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, প্রকাশক, জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃবৃন্দের ক'জন নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসৎ ও ঘৃণ্য পন্থা

অবলম্বন করে না? এদের ক'জন মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতিসাধন করতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে? বড় জোর দেশের শতকরা মাত্র পাঁচজন এসব নৈতিক রোগ থেকে মুক্ত রয়েছে, আমার মনে হয় এ কথা মোটেই অত্যুক্তি নয়। বাকী পঁচানব্বই জনই এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত। এ ব্যাপারে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতির ভেতর কোন পার্থক্য নেই। সবাই সমানভাবে রোগাক্রান্ত। সবারই নৈতিক অবস্থার চরম ও ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। কোন জাতির অবস্থাই অন্য জাতির চেয়ে ভালনয়।

অধিকাংশ লোক এরূপ নৈতিক অধপতনের কবলে পড়ায় সমষ্টিগতভাবে এই নৈতিক রোগের ব্যাপক প্রসার হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। গত মহাযুদ্ধের কারণে যখন রেল গাড়ীতে যাত্রীদের ভীড় হতে লাগলো তখন এই সম্ভাব্য তুফানের প্রথম লক্ষণ দেখা দিল। সেখানে একই জাতির ও একই দেশের লোকেরা পরস্পরের সংগে যে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতামুলক ব্যবহার করেছে, তা থেকেই টের পাওয়া গিয়েছিল যে, কেবল দ্রুতগতিতে আমাদের সাধারণ নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটছে। এরপর প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অভাব ও উচ্চমূল্যের সময় মাল মওজুদ রাখা এবং চোরাবাজারী ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। অতপর দেখা দিল বাংলাদেশের সেই ভয়াবহ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ। এই দুরাবস্থার সময় দেশের এক সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য নিজেদের দেশের লাখো লাখো মানুষকে ভুখা রেখে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। এসব ছিল প্রাথমিক লক্ষণ। এরপর নোংরামি, বর্বরতা, নীচতা, পশুসুলভ আচরণ ইত্যাদির অগ্নিকান্ড হঠাৎ ফেটে পড়লো। এগুলো এখানকার গভীরে বহুদিন হতে উত্তপ্ত হচ্ছিল। বর্তমানে একটি সাম্প্রদায়িক দাংগারূপে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত

পর্যন্ত সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই করে দিচ্ছে। কলকাতার গোলযোগের পর থেকে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের জাতীয় বিরোধের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনটি জাতিই তাদের জঘন্য চরিত্রের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছে।

যে সমস্ত কায কোন মানুষ করতে পারে বলে ধারণাও করা যেত না, তা আজ আমাদের দেশবাসীরা প্রকাশ্যে করে যাচ্ছে। বড় বড় অঞ্চলের প্রায় সমস্ত লোক গুন্ডায় পরিণত হয়েছে। গুন্ডারা যে কাজ করার ধারণাও কোন দিন করেনি তাও এখন তারা করছে। দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদের মায়ের বুকের ওপর রেখে জবাই করা হয়েছে। , জীবন্ত মানুষদেরকে আগুনে জ্বালানো হয়েছে। ভদ্র মহিলাদের হাযার হাযার লোকের সামনে উলঙ্গ করে তাদের উপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। পিতা, ভাই ও স্বামীর সামনে তাদের মেয়ে বোন ও স্ত্রীর শ্লীলতা হানি করা হয়েছে। মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় গ্রন্থরাজির ওপর ক্রোধ প্রকাশ করতে গিয়ে অত্যন্ত পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। রুগ্ন, আহত ও বৃদ্ধদেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। পথিক যাত্রীদেরকে চলন্ত গাড়ী থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। জীবন্ত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হয়েছে। নিরীহ ও অক্ষম লোকদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মতো শিকার করা হয়েছে। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর গৃহ লুটতরায করেছে। বন্ধুর প্রতি বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আশ্রয় দাতা আশ্রয় দিয়ে নিরাশ্রয় করেছে। শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষকগণ (পুলিশ, সৈন্য ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণ) প্রকাশ্যে দাংগায় অংশ গ্রহণ করেছে, এমনকি তারা নিজেরাই দাংগা করেছে এবং নিজেদের সাহায্য সহানুভূতি ও তত্ত্বাবধানে দাংগা বাঁধিয়েছে। মোট কথা- অত্যাচার, অনাচার, নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহার, বর্বরতা ও জঘন্য কার্যকলাপ ইত্যাদির কোন কিছু আর বাকী নেই, যা এই কয়েক মাসের ভেতর আমাদের দেশের

লোকেরা সমষ্টিগতভাবে করেনি। তবুও মনের জ্বালা মেটেনি। আলামত যা দেখা যাচ্ছে, মনে হয় এর চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ ও বিরাট আকারে দাংগা এখন দেখা দেবে।

আপনারা কি মনে করেন, এসব কিছুই একটা আকস্মিক উত্তেজনার ফল মাত্র? এরূপ ধারণা করে থাকলে আপনারা বিরাট ভুলের মধ্যে আছেন বলতে হবে। এইমাত্র আমি আপনাদের বলেছি যে, এ দেশের শতকরা পঁচানব্বই জন নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দেশের জনসমষ্টির এত বিরাট অংশ যদি অসৎচরিত্রের হয়ে পড়ে তা হলে জাতির সমষ্টিগত স্বভাব-চরিত্র কেমন করে ঠিক থাকতে পারে? এই জন্যই তো হিন্দু-মুসলমান ও শিখ জাতির কাছে সত্যবাদিতা, সুবিচার ও সততার কোন দামই এখন নেই। সত্যপন্থী, সৎ এবং ভদ্রস্বভাব বিশিষ্ট লোকেরা তাদের ভিতর কোণঠাসা ও দুর্বল হয়ে রয়েছে। মন্দ কাজে বাধা দান এবং ভাল কাজ করার জন্যে উপদেশ দেয়া তাদের সমাজে অসহনীয় অপরাধে পরিণত হয়েছে। সত্য ও ন্যায় কথা শুনতে তারা প্রস্তুত নয়। তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি জাতিই এমন লোকদেরকে পসন্দ করে যারা তার সীমাহীন লোভ লালসা ও স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করে এবং অন্যের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করে তার ন্যায় ও অন্যায় সব রকম স্বার্থোদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়। এ জন্যই এরা নিজেদের ভেতর থেকে বেছে বেছে সব চেয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করেছে। তারা নিজেদের জঘন্যতম অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে নিজেদের নেতৃত্বপদে বরণ করে নিয়েছে। তাদের সমাজের সবচেয়ে দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিবাজ, বিবেকহীন লোকেরা তাদের মুখপাত্র সেজে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অত্যধিক বরণীয় হয়েছে। অতপর এসব লোকেরা নিজ নিজ পথভ্রষ্ট জাতিকে নিয়ে ধ্বংসের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। তারা জাতির

পরস্পর বিরোধী আশা–আকাংখাকে কোন ইনসাফের কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত না করে তাকে এতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে যে, তা অবশেষে সংঘর্ষের সীমান্তে পৌছেছে। তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘর্ষে ক্রোধ, ঘৃণা, শত্রুতার বিষ মিশিয়ে একে নিত্য অগ্রবর্তী করেছে। বহু বছর ধরে নিজেদের প্রভাবাধীন জাতিগুলোকে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা ও রচনার ইনজেকশন দিয়ে এতখানি উত্তেজিত করে তুলেছে যে, এখন উত্তেজনাবশত কুকুর ও হিংস্র পশুর মত লড়াই করবার জন্য খড়গ উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজের মনকে পৈশাচিক আবেগ ও উচ্ছাসে দুর্গন্ধময় এবং অন্ধ শত্রুতার চুল্লীবানিয়ে ফেলেছে। আপনাদের সামনে এখন যে তুফান প্রবাহিত হচ্ছে তা মোটেই সাময়িক ও আকস্মিক নয়। বহু দিন থেকে বিকৃতির যেসব বেশুমার কার্যকারণ আমাদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে এ হলো তারই স্বাভাবিক পরিণতি। এটা একবার দেখা দিয়েই ক্ষান্ত হবে না। বরং যতদিন পর্যন্ত এসব কার্যকারণ সক্রিয় থাকবে, ততদিন এ বিকৃতি ক্রমশ বাড়তে থাকবে। এটা একটা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মত। বহু বছরের বীজ বপন ও জল সেচনের পর এ ফসল খাবার উপযুক্ত হয়েছে। এখন আপনাকে এবং আপনার বংশধরদেরকে কতদিন পর্যন্ত এ ফসল কাটতে হবে তা বলা যায় না।

ভাইসব! আল্লার আইন অনুযায়ী এদেশের ভাগ্যে শীঘ্রই নতুন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব আসছে। এখন ঠান্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করুন যে, এ সময় আমরা দেশের আসল মালিকের সামনে নিজেদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার কি প্রমাণ দিচ্ছি। এখন আমাদের কার্যকলাপের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করার সুযোগ ছিল যে, তিনি আমাদেরকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা দিলে আমরা একে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে গড়ে তুলব। এখানে আমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করব। এর সমস্ত উপায় উপাদানকে নিজেদের এবং মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করব।

এখানে সমস্ত ভাল কাজের উন্নতি বিধান এবং সমস্ত মন্দ কাজে বাধা দান করবে। কিন্তু আমরা তাঁর কাছে এই প্রমাণ দিচ্ছি যে, আমরা এখন ধ্বংসকারী। তিনি আমাদেরকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা দান করলে আমরা দেশের সমস্ত বসতি উজাড় করে দেব। মহল্লা ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেব। মানুষের জীবনকে মশা মাছির চেয়েও মূল্যহীন মনে করব। মেয়েদের শ্লীলতা হানি করব। ছোট শিশুদেরকে শিকার করব। বুড়ো, রোগী ও আহতদের প্রতিও দয়া করব না। মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় গ্রন্থও আমাদের পৈশাচিক আচরণ থেকে নিস্তার পাবে না। যে দুনিয়াকে আল্লাহ মানুষের আবাস স্থলে পরিণত করেছেন, আমরা মানুষ মেরে এবং বাড়ীঘর জ্বালিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব।

এমতাবস্থায় আপনাদের বিবেক কি সত্যিই সাক্ষ্য দেয় যে, এহেন দেশসেবা, এরূপ গুণপনা এবং কার্যাবলীর ফিরিস্তি পেশ করে আপনারা আল্লার নযরে তাঁর দেশের শাসন পরিচালনার জন্য যোগ্যতম বলে প্রমাণিত হতে পারবেন? এসব কাজ দেখেই কি তিনি আপনাদেরকে বলবেনঃ সাবাশ! আমার পুরোনো মালীর বংশধর!! এই বাগানের পরিচালনার জন্য তোমরাই যোগ্যতম। এই বিশৃংখলা, ধ্বংস, বিকৃতি, প্রলয়, অনিষ্ট সাধন এবং আবর্জনা সৃষ্টির জন্যই তো আমি এ বাগানখানা তৈরী করেছিলাম, কাজেই এটার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এখন তোমরা একে খুব ভাল করেই নষ্ট কর।

আপনাদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাওয়ার জন্য এসব কথা বলছিনে। আমি নিজে যেমন নিরাশ নই, তেমনি কাকেও নিরাশ করতেও চাইনে। আসলে আমার বক্তব্য এই যে, কয়েক শতাব্দির পর কোন দেশের ভাগ্য পরিবর্তনের সময় আল্লাহ ঐ দেশবাসীকে ক্ষমতা লাভের সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার দরুন সেই সব

সুযোগ হারাতে বসেছে। এ পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে যোগ্যতা ও গুণাবলীর প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল। এভাবে তারা আল্লার দৃষ্টিতে দেশ পরিচালনার যোগ্য ও উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হতে পারতো। কিন্তু আজ তাদের ভেতর এই প্রতিযোগিতা চলছে যে, কে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসকারী, কে বড় খুনী এবং কে বড় অত্যাচারী। এভাবে তারা সবার চেয়ে বেশী খোদ অভিশাপের যোগ্য হচ্ছে। আযাদী, উন্নতি ও প্রগতির লক্ষণ এসব নয়। এতে তো আশংকা হচ্ছে যে, আবার এক দীর্ঘ কালের জন্য আমাদের ভাগ্যে দাসত্ব ও অপমানের ফায়সালা লিখিত না হয়ে যায়। কাজেই এ অবস্থার সংশোধনের জন্য বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোকদের চিন্তা করা উচিত।

এপর্যায়ে আপনাদের মনে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন জাগবে যে, সংশোধনের উপায় কি? আমি এর জবাব দিতে প্রস্তুত।

এই অন্ধকারে আমাদের জন্য আশার একটি মাত্র আলোক রেখা দেখা যাচ্ছে। সেটা এই যে, আমাদের দেশের সমস্ত অধিবাসীই বিকৃত স্বভাব হয়ে যায়নি। অন্তত শতকরা চার পাঁচ জন লোক বর্তমান নৈতিক অধপতন থেকে বেঁচে আছে। এই পুঁজি নিয়ে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। এই সৎলোকগুলোকে খুঁজেবের করে সংঘবদ্ধ করাই হবে সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ হলো এই যে, এখানে অসৎ বেশ সংঘবদ্ধভাবে রীতিমত কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সৎ সংঘবদ্ধ নয়। সৎলোক আছে নিশ্চয়ই কিন্তু তারা বিক্ষিপ্ত। তাদের ভেতর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব নেই। কোন সহযোগিতা ও সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। তাদের কোন কার্যসূচী ও সম্মিলিত আওয়াযও নেই। এ জন্যেই তারা একেবারে প্রভাবহীন ও দুর্বল হয়ে রয়েছে। সময় সময় চতুস্পার্শের দুষ্কর্ম দেখে হয়তো কোন আল্লার বান্দা চীৎকার

করে উঠে কিন্তু যখন কোন দিক থেকে কোন আওয়ায তার সমর্থনে না আসে তখন সে নিরাশ হয়ে চুপ করে বসে পড়তে বাধ্য হয়। কোন সময় হয়ত কেউ হক ও ইনসাফের কথা প্রকাশ্যে বলে ফেলে, কিন্তু সংঘবদ্ধ অসৎ শক্তি জোর করে তার মুখ বন্ধ করে দেয় এবং সত্যপন্থি লোকেরা তাকে চুপে চুপে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যায়। কখনো হয়তো কেই মানবতার হত্যা প্রত্যক্ষ করে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না এবং তার প্রতিবাদ করে বসে, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা এক জোট হয়ে তাকে দমন করে। ফলে যাদের মধ্যে এখনো কিছুটা চেতনা আছে তারা তার এহেন দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে সাহস হারিয়ে ফেলে। এখন এ আবস্থার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। আমরা যদি আমাদের দেশের উপর আল্লার আযাব প্রত্যাশা না করি এবং এও প্রত্যাশা করি যে, এ আযাবের মুখে দেশের সৎ ও অসৎ সমস্ত লোক নিক্ষিপ্ত হোক, তাহলে আমাদের মধ্যকার যে সমস্ত সৎলোক এখনো এ নৈতিক ব্যাধি মুক্ত রয়েছে, তাদেরকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। যে ক্রমবর্ধমান আন্যায় ও ফেতনা ফাসাদ আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এ সংঘবদ্ধ সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বর্তমানে এই সৎলোকগণ বাহ্যত অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক সংখ্যালঘুতে রয়েছে দেখে আপনারা ঘাবড়াবেন না। এ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক যদি সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, এদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন খাঁটি, সত্য ও সততা, ইনসাফ, আন্তরিকতা, সৎ নীতি ও নৈতিকতার ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবনের যাবতীয় সমস্যার একটি উৎকৃষ্ট সমাধান ও দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার সঠিক পন্থায় পরিচালনা করার জন্য একটা সুষ্ঠু কর্মসূচী এরা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে নিশ্চিত

জেনে রাখুন এভাবে সৎলোকেরা সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল হয়ে সংগ্রাম করতে থাকলে তাদের শক্তির সামনে সংঘবদ্ধ অসৎ শক্তি, বহু জনবল এবং পৈশাচিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য সত্ত্বেও পরাজিত হতে বাধ্য হবে। মানুষের প্রকৃতি অসৎ নয়। তাকে অবশ্যি ধোঁকা দেয়া যেতে পারে এবং অনেকটা বিকৃতও করা যেতে পারে। কিন্তু তার ভেতর সততা ও কল্যাণের যে মূল্যবোধ আল্লাহ আমানত রেখেছেন তাকে একেবারে খতম করা সম্ভব নয়। এরূপ লোক কমই হয়ে থাকে যারা অসৎকেই পসন্দ করে এবং তার ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে সৎ ও সত্যের প্রতি গভীর প্রেম এবং তাকে-কায়েম করার জন্যে সংগ্রামী প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষমতাও কম লোকেরই থাকে। এ দুই দলের মাঝখানে সাধারণ লোকেরা সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের মিশ্রিত মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়ে তারা ভাল ও মন্দ কোনটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। ভাল ও মন্দের ধারকগণ অগ্রবর্তী হয়ে তাদেরকে যে পথে টেনে নিয়ে যায় তারা সেই পথেই যায়। ভালোর ধারকগণ কর্মক্ষেত্রে না থাকলে এবং তাদের পক্ষ থেকে সাধারণ লোকদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালানো না হলে মন্দের ধারকদের হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব থাকবে এবং তারা সাধারণ লোকদেরকে নিজেদের পথে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু যদি ভালোর ধারকরা কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং সংশোধনের যথাযোগ্য চেষ্টায় ত্রুটি না করে, তাহলে সাধারণ লোকের ওপর মন্দের ধারকদের প্রভাব বেশীদিন থাকতে পারে না। কারণ শেষ পর্যন্ত নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রেই এ উভয় দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। সেখানে অসৎ লোকেরা সৎলোকদেরকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। সত্যের মুকাবিলায় পৈশাচিকতা ও সুষ্কর্ম যতই জোরদার হোক না কেন শেষ পর্যন্ত সত্য, বিশ্বস্ততা এবং পবিত্রতার বিজয় সূচিত হয়। দুনিয়া অনুভূতিহীন নয় যে,

সৎচরিত্রের মাধুর্য এবং অসৎচরিত্রের তিক্ততা আস্বাদন করার পরও পরিশেষে মাধুর্যের চেয়ে তিক্ততা ভাল বলে গ্রহণ করবে।

সংশোধনের জন্য সৎলোকদের সংগঠনের সাথে সাথে ভাঙ্গা ও গড়া সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। ভাঙ্গা কি তা আমাদেরকে ভাল করে বুঝে নিতে হবে। তাহলেই ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা যাবে। এমনিভাবে গড়া কি তাও জানতে হবে। তা হলেই তার বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অত্যন্ত সংক্ষেপে এ দুটোর পরিচয় পেশ করব।

মানবজীবনে যেসব কারণে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় সেগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম হচ্ছে– আল্লাহকে ভয় না করা। এটাই দুনিয়ায় সব রকমের অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও যাবতীয় দুর্নীতিরমূল।

দ্বিতীয় হচ্ছে– আল্লাহর বিধান মেনে না চলা। এটিই মানুষের জন্যে কোন ব্যাপারেই অনুসরণযোগ্য স্থায়ী নৈতিক বিধান অবশিষ্ট রাখেনি। এরি বদৌলতে ব্যক্তি, দল ও জাতির সমস্ত কর্মধারা স্বার্থপূজা, ভোগ–বিলাস ও কামনা–লালসার দাসত্বের অধীন হযে গিয়েছে। এরি ফলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ পার্থক্য করে না এবং উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্যে যে কোন রকমের অসদুপায় ও দূর্নীতি অবলম্বন করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না।

তৃতীয় হচ্ছে– স্বার্থপরতা। এরি কারণে মানুষ পরস্পরের অধিকার হরণ করে। এমন কি ব্যাপকভাবে খান্দানী ও জাতীয় আভিজাত্য এবং শ্রেণী বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এবং এথেকে নানান ফেতনা ও বিপর্যয়ের উদ্ভব হয়।

চতুর্থ হচ্ছে– জড়তা অথবা বিপথগামিতা, এর দরুন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতা হয়তো কোন কাজে ব্যবহারই করে না, কিংবা তার অপব্যবহার করে অথবা আল্লাহ প্রদত্ত উপায়–উপাদানকে কাজেই লাগায় না কিংবা অকাজে লাগায়। প্রথম অবস্থায় আল্লাহ এহেন অপদার্থ ও অলস লোকদেরকে বেশী দিন দুনিয়ায় ক্ষমতাসীন থাকতে দেন না বরং তাদের বদলে যারা কিছু না কিছু গঠনমূলক কাজ করে তাদেরকে ক্ষমতা দেন। এটাই আল্লাহর নিয়ম। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন দুষ্কৃতিকারী জাতির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ তাদের গঠনমূলক কাজের চেয়ে বেশী হতে থাকে তখন তাদেরকে নিজেদেরই ধ্বংসকারিতার দরুন ধ্বংসের মূলে ঠেলে দেয়া হয়।

অপর দিকে মানুষের জীবন যেসব উপায়ে সুন্দররূপে গড়ে উঠে তাকেও চার ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমটি হচ্ছে– আল্লাহ ভীতি। মানুষকে অসৎ পথ থেকে বিরত রাখা এবং সৎপথে চালাবার জন্য এটাই হচ্ছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। সত্যবাদিতা, সততা, ইনসাফ, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মসংযম ইত্যাদি সমস্ত সৎগুণাবলীই এ উৎস থেকে সৃষ্টি হয়। একটা শান্তিপূর্ণ ও উন্নত সভ্যতা ও তামাদ্দুন যেসব সৎগুণরাজির ভিত্তিতে গড়ে উঠে, তা সব এই বীজ থেকেই জন্মলাভ করে। অবশ্যি অন্যান্য বিশ্বাস ও নীতির সাহায্যে এসব গুণাবলী কিছু না কিছু সৃষ্টি করা যেতে পারে– যেমন করে পাশ্চাত্য জাতিগুলো নিজেদের ভেতর এসব গুণ কিছু কিছু সৃষ্টি করেছে– কিন্তু এভাবে অর্জিত গুণপনা কোন এক পর্যায়ে পৌঁছে আর অগ্রসর হতে পারে না এবং শেষ পর্যায় পর্যন্তও দুর্বল রয়ে যায়। অসৎ পথ থেকে বিরত রেখে সৎপথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় বলিষ্ঠ চরিত্র একমাত্র আল্লাহভীতির ভিত্তিতেই

স্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয়। এরূপ সুগঠিত চরিত্র শুধু সীমাবদ্ধভাবেই নয়, ব্যাপকভাবেই যাবতীয় কর্মকান্ডের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় হচ্ছে– আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা। মানুষের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কাজ–কারবার নৈতিকচরিত্রের চিরন্তন নিয়ম–নীতি অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য এটিই একমাত্র পথ। মানুষ নিজেই যখন তার নৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তখন বলার সময় সে যে নীতি ব্যবহার করে, কাজ করার সময় করে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর নীতি। বই পুস্তকে সোনালী হরফে মানুষ এক প্রকার নীতি লিখে থাকে আর বাস্তব জীবনের কাজ কারবারে নিজের মতলব অনুযায়ী একেবারে স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন করে থাকে। অন্যের কাছে দাবী করার সময় তার নীতি এক রকমের হয়, আর নিজের কাছে অন্যের দাবী পেশ করা হলে তার নীতি অন্য রকমের। সুযোগ–সুবিধে, কামনা, প্রয়োজনের চাপে সব সময় তার নীতির পরিবর্তন হতে থাকে। "সত্যের পরিবর্তে নিজের স্বার্থকে" সে নৈতিকতার আসল কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করে। সত্য নীতি অনুযায়ী নিজের কার্যাবলী সম্পন্ন করা কর্তব্য বলে সে স্বীকারই করে না। এর বদলে সে সত্যকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী ঢালাই করতে চায়। এজন্যেই মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনধারা ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং এথেকেই দুনিয়ায় ফেতনা–ফাসাদ বিস্তার লাভ করে। পক্ষান্তরে যার সাহায্যে মানুষ শান্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, তা হচ্ছে একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর নৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কারোর স্বার্থ অনুযায়ী নয় বরং সত্যের ভিত্তিতে গঠিত হতে হবে। এ ব্যবস্থাকে চিরন্তন ও অকাট্য বলে মেনে নিয়ে জীবনের সমস্ত কাজ–কারবারে তদানুযায়ী চলতে হবে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, জাতীয় জীবনে, ব্যবসায়–বাণিজ্যে, রাজনীতিতে, যুদ্ধ ও সন্ধিতে প্রতি ক্ষেত্রেই এটা কার্যকরী করতে হলে এতে কোন

পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না করে মানুষকে এর অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মেনে নিতে হবে।

তৃতীয় হচ্ছে–মানবতার ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তিগত, জাতীয় , বংশীয় সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার পরিবর্তে সমস্ত মানুষের সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার থাকবে। এর ভেতর অযথা বৈষম্য, উচ্চ–নীচু, অপবিত্রতার ধারণা, কৃত্রিম গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। এতে কতক লোকের জন্য কৃত্রিম বিধিনিষেধ ও বাঁধা বিপত্তি থাকবে না। এতে সবারই উন্নতি ও প্রগতির সুযোগ সুবিধা থাকবে। দুনিয়ার সব মানুষ সমানভাবে মিলে মিশে থাকতে পারে, এমন ব্যাপক হতে হবে এ ব্যবস্থা।

চতুর্থ হচ্ছে সৎকাজ। এর মানে হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও উপায় উপাদানকে পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে কাজে লাগানো।

ভাইসব। এই চারটি বিষয়ের সমষ্টির নাম হচ্ছে গড়া ও সংশোধন। আমাদের ভেতরকার সৎলোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটা সংগঠনের মধ্যে রয়েছে আমাদের সবার কল্যাণ। এ সংগঠন সমস্ত প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ ও ভাঙ্গনের পথ বন্ধ করবে এবং উল্লেখিত উপায়ে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে অবিরাম গড়ার প্রচেষ্টা চালাবে। এ প্রচেষ্টা এ দেশবাসীকে সঠিক পথে আনতে সফল হলেও আল্লাহ দেশের শাসন ক্ষমতা অযথা দেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেবেন এমন অবিচারক তিনি নন। কিন্তু যদি এতে সফলকাম না হওয়া যায়, তাহলে আমাদের, আপনাদের ও সমস্ত দেশবাসীর পরিণাম কি হবে তা বলা যায় না।

সমাপ্ত